RAY: International Journal of Multidisciplinary Studies, E-ISSN: 2456-3064
Volume VII, No. 2 / October, 2022, pp. 49-64.

পুনর্বিবাহ: একা সমীক্ষা

Soma Bangal
State Aided College Teacher (Category-I),
Chakdaha College,
Chakdaha, Nadia, India.
sbsoma83@gmail.com

Structured Abstract:

সারসংক্ষেপ: প্রাচীন ভারতীয় জীবনযাত্রা চারটি আশ্রমে আবদ্ধ ছিল । চারটি আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমই সর্বশ্রেষ্ঠ, কারণ গৃহস্থই অন্য তিনটি আশ্রমের ধারক ও পোষক । এই গার্হস্থ্যাশ্রমের প্রবেশপথ হল বিবাহ । বৈদিকসাহিত্য থেকে শুরু করে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, স্মৃতিশাস্ত্র সর্বত্রই বিবাহের নিয়ম-নীতি, আচার প্রভৃতির বিস্তৃত আলোচনার পাশাপাশি পুরুষের বহুবিবাহের উল্লেখ পাওয়া গেলেও নারীর দ্বিতীয় বিবাহ প্রসঙ্গে নিশ্চুপ থেকেছেন প্রায় সকলেই । যদিও সজাতীয় পুরুষ বা দেবরের দ্বারা সন্তান ধারণের কথা জানা গেলেও নারীর দ্বিতীয় সংসারজীবনের কথা অন্ধকারেই বিদ্যমান । পরাশর, নারদ প্রমুখ স্মৃতিশাস্ত্রগণ নারীর পুনর্বিবাহ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করেছেন তারই প্রতিফল বিদ্যাসাগর মহাশয়ার প্রচেষ্টায় বিধবা বিবাহ আইন পাশ ।

সাংকেতিক শব্দ: বিবাহ, বিবাহের প্রয়োজনীয়তা, নারীর পুনর্বিবাহ, গ্রহণযোগ্যতা।

প্রণালী (Methodology): গবেষণাপত্রটি বর্ণনামূলক ও তুলনামূলকভাবে লিখিত হয়েছে । প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থগুলির উপর নির্ভর করে ও বর্তমান সমাজে কতটা ফলদায়ক তা তথ্যভিত্তিক পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করা হয়েছে ।

প্রকল্প (Hypothesis):

- স্মৃতিকারগণ কর্তৃক বিবাহের সংজ্ঞা ও প্রয়োজনীয়তা।
- কোন কোন ক্ষেত্রে নারীর পুনর্বিবাহ সমাজস্বীকৃত।
- বিধবাবিবাহ আইন বর্তমানে কতটা ফলদায়ক ।

ভূমিকা

মানবসমাজকে সভ্য সুশৃঙ্খল ও আনন্দময়রূপে গড়ে তুলতে প্রাচীনকাল থেকে নানা রীতি-নীতি, বিধি-বিধান ও সামাজিক অনুশাসন তৈরী হয়েছে । ভারতীয় সমাজদর্শনও এর ব্যতিক্রম না । প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় প্রজ্ঞাবান ঋষিগণ মানবজীবনকে মাধুর্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য নানাবিধ আচারবিধির উপদেশ দিয়েছেন । মানবজীবনের চারটি আশ্রমের মধ্যে শাস্ত্রকারগণ অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন গার্হস্থ্যাশ্রমকে । এই আশ্রমেই একজন মানুষ তার জন্মসূত্রে প্রাপ্ত ঋণ পরিশোধের সুযোগ পায় । আচার্য মনুর মতে গার্হস্থ্যাশ্রম সর্বশ্রেষ্ঠ । গৃহস্থই অন্য তিনটি আশ্রমের ধারক ও পোষক - 'গৃহস্থ উচ্যতে শ্রেষ্ঠঃ স ত্রীনেতান্ বিভর্ত্তি হি' (মনুস্মৃতি - ৬.৮৯) । এই গার্হস্থ্যাশ্রমের প্রবেশপথ হল বিবাহ । ঋষিগণ উপদৃষ্ট মানবজীবনের ষোড়শ সংস্কারের মধ্যে অন্যতম হল বিবাহ সংস্কার । বিবাহ হল বহুজনস্বীকৃত একটি অনুষ্ঠান, যার দ্বারা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধিত হয় । এটি একটি বৃহৎ কর্মযজ্ঞ । ব্যক্তির সঙ্গে গোষ্ঠীর সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করার নিমিত্ত কতকগুলি স্থায়ী ও অনুমোদিত কার্যাবলি হল বিবাহ । পারিবারিক জীবনকে সুন্দরতম করে গড়ে তোলার জন্য শাস্ত্রকারগণ বিবাহবিধি নিজ নিজ গ্রন্থে ব্যক্ত করেছেন ।

বিষয়বস্তু

'বিবাহ' শব্দটি বহ্-ধাতু সহ ঘঞ্ প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন হয়েছে । বহ্-ধাতুর অর্থ বহন করা । বিশেষরূপে বহনই হল বিবাহ । স্মৃতিকার রঘুনন্দন তাঁর 'উদ্বাহতত্ত্ব' গ্রন্থে বিবাহের সংজ্ঞা করেছেন - 'ভার্যাত্বসম্পাদকগ্রহণং বিবাহঃ' 'এই নারী আমার ভার্যা' এইরকম প্রতিজ্ঞা করে পুরুষ কর্তৃক নারীকে গ্রহণ করাই হল 'বিবাহ' । এর তাৎপর্য হল স্ত্রীর আত্মাকে বর কর্তৃক আত্মসাৎ করার যে সংস্কার তারই নাম বিবাহ । এই বিবাহানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্ত্রী ও স্বামী একাত্মতায় ও একাঙ্গে রূপান্তরিত হয় এবং তার স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনীরূপে পরিচিত হয় । মেধাতিথির মতে ব্রাহ্ম প্রাজাপত্য প্রভৃতি উপায়ে যে কন্যা লাভ করা যায় তাকে ভার্যা করার জন্য সাঙ্গোপঙ্গ যে সংস্কার অনুষ্ঠান করা হয় তাই বিবাহ - 'স্ত্রীসংস্কার্থা বিবাহ ইতি স্ত্রীবিবাহাঃ । কা পুনরয়ং নাম উপায়তঃ প্রাপ্তায়াঃ দারকবনার্থঃ সংস্কারঃ সোতিকত্তর্ব্যতাঙ্গঃ সপ্তর্ষিদর্শনপর্যন্তঃ

পাণিগ্রহণলক্ষণঃ’ (মেধাতিথি, মনুসংহিতা - ৩.২০) । ‘বিবাহ’ শব্দের প্রতিশব্দ বা সমর্থকশব্দ রূপে ঋগ্বেদে হস্তগ্রাভ (১০.১.১৮.৮), বহতুম্ (১০.২.১৩.১) প্রভৃতি শব্দ উল্লেখিত আছে । বিবাহ সংস্কারের কতকগুলি প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান ভিন্ন ভিন্ন নামে উল্লেখিত হয় কিন্তু এগুলি প্রত্যেকটি সম্পূর্ণ বিবাহকেই নির্দেশ করে । যেমন উদ্বাহ, বিবাহ, পরিণয়, পরিণয়ন, উপযম, পাণিগ্রহণ । ‘উদ্বাহ’ পদের অর্থ বিবাহের পর নারীকে তার পিতৃগৃহ থেকে বর কর্তৃক নিজগৃহে আনয়ন । নারীর সাথে হোমাগ্নির চতুষ্পার্শে পরিক্রমণ হল পরিণয় । উপযম অর্থাৎ নারীকে নিজের কাছে নিয়ে আসা এবং হোমাগ্নিকে সাক্ষী রেখে নিজের করে পাওয়া । কন্যার হাত ধরা এবং তাকে নিজের বলে মনে করা হল পাণিগ্রহণ । পাণিগ্রহণবিষয়ে ঋগ্বেদে উক্ত হয়েছে - ‘গৃভনামি তে সৌভাগাত্বায় হস্তম্’ (১০.৮৫.৩৬) । তৈত্তিরীয়সংহিতাতে (৭.২.৮৬) বিবাহের পরিবর্তে ‘উদ্বাহ’ শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় । লিখিতসংহিতা (১.৩৫) ও সংবর্ত্তসংহিতাতে বিবাহ শব্দের নামান্তর করা হয়েছে সপ্তপদী ।

বিবাহের উদ্দেশ্য

‘বিবাহ’ সংস্কারের মুখ্য উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ নিজ নিজ গ্রন্থে স্বকীয় মতামত ব্যক্ত করেছেন । ‘বিবাহ’ সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য হল এই পবিত্র অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবিষ্ট পুরুষদ্বারা তার পরিণীতা স্ত্রীর সঙ্গে দেবতা পূজা, যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, সন্তানাদি উৎপাদন প্রভৃতির মাধ্যমে সমাজের মঙ্গল বিধান করা । স্ত্রী ব্যতীত পুরুষের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে অধিকার নেই । বেদে প্রায়শঃ শোনা যায় সপত্নিক যজমান কেবলমাত্র যজ্ঞকর্মে অধিকারী । এই কারণে মনু স্ত্রীদের রক্ষা করা একান্ত কর্তব্য বলে নির্দেশ দিয়েছেন ।

পতিভার্যাং সংপ্রবিশ্য গর্ভো ভূত্বহ জায়তে ।
জায়ায়াস্তদ্ধি জায়াত্বং সদস্যাং জায়তে পুনঃ ।। (মনুসংহিতা - ৯.৮)

মহাভারতের শান্তিপর্বে স্ত্রীই হল প্রকৃত গৃহস্বরূপ । পতি পত্নীর মধ্যে কোনও একজন বিচ্ছিন্ন হলে ধর্মানুষ্ঠানে কোন অধিকার থাকে না - ‘ন গৃহং গৃহমিত্যাহুগৃহিণী গৃহমুচ্যতে’ (মহাভারত, শান্তিপর্ব -১৪৪.৬৬) । আপস্তম্বধর্মসূত্রে (২.৬.১৩.১৬-১৭) ঋষির মুখে ধ্বনিত হয়েছে –

‘জায়াপত্যোর্ন বিভাগো বিদ্যতে ।

পাণিগ্রহণাদ্ধি সহত্বং কর্মসু ।।

শতপথব্রাহ্মণে ঋষি বলেছেন স্ত্রী হল পুরুষের অর্ধাংশ; গার্হস্থ্যধর্মপালনে ইচ্ছুক পুরুষ বিবাহসংস্কার না করে এবং যতদিন পর্যন্ত সন্তানের জন্ম না হয়, ততদিন পর্যন্ত সেই পুরুষ 'অসর্ব' অর্থাৎ অপূর্ণ থাকে । স্ত্রী গ্রহণে এবং তার মাধ্যমে সন্তানের জন্ম হলে সেই পুরুষ হয় 'সর্ব' অর্থাৎ পূর্ণ - 'অথ যদৈব জায়াং বিন্দতেঽথ প্রজায়তে তর্হি সর্বো ভবতি' (শতপথব্রাহ্মণ – ৫.২.১.১০) আচার্য মনু বলেছেন স্ত্রীর মাধ্যমেই গৃহস্থের নিত্য শুভ লোকযাত্রা নির্বাহ হয় । সন্তানজন্মের সহায়িকা হবার জন্য স্ত্রী হল গৃহের দীপ্তিস্বরূপা, মহা-উপকারিণী এবং পূজার যোগ্যা । গৃহে স্ত্রীই হল শ্রী - মনু মনে করেন । ধর্মকর্মানুষ্ঠান, অপত্যলাভ, শুশ্রূষা, উত্তমা গতি, পিতৃপুরুষের স্বর্গপ্রাপ্তি – এই সবই ভার্যার অধীন (মনুসংহিতা-৯.২৮) । বিবাহবন্ধনের দ্বারাই মানুষের সকল প্রকার ঋণমুক্তি ঘটে । আচার্য মনুর মতে এই সংস্কার হেতু পুত্রোৎপাদনার্থ পিতার 'পুৎ' নামক নরক থেকে পরিত্রাণ লাভ হয় –

পুন্নাম্নো নরকাদ্ যস্মাৎ ত্রায়তে পিতরং সুতঃ ।

তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা ।। (৯.১৩৮)

সংহিতাকার অত্রি ও বিষ্ণু এবিষয়ে মনুর মতানুসারী । আচার্য মনু পুত্র বিষয়ে এও বলেছেন পুত্রের জন্মের দ্বারা মানুষের স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে । শুধু পুত্রোৎপাদন নয়, দৈহিক চাহিদা পরিতৃপ্তি, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতির উদ্দেশ্যে বিবাহসংস্কার করণীয় ।

বিবাহ বিষয়ে সকল স্মৃতিকারগণ অল্পবিস্তার তদীয় শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করেছেন । আমাদের প্রবন্ধের মুখ্য বিষয় বিবাহ না, নারীর পুনর্বিবাহ, তাই বিবাহ প্রাসঙ্গিক বিস্তৃত আলোচনা না করে মূল বিষয়ে মনোনিবেশ করা হল ।

পুনর্বিবাহ

সুপ্রাচীন বৈদিকযুগ থেকেই ভারতীয় ঐতিহ্যে একপত্নী গ্রহণকে সর্বাঙ্গীন মর্যাদা দেওয়া হলেও ঐ একই সময় থেকে আবার বহুপত্নী গ্রহণের নিদর্শন বিস্তৃতরূপে পাওয়া যায় সংস্কৃতসাহিত্যে । যথা – চ্যবন ঋষির বহুপত্নী (*ঋগ্বেদ* – ১০.১১৬.১০), বৃহদারণ্যকোপনিষদে যাজ্ঞবল্কের দুই

পত্নী, রামায়ণের দশরথের একাধিক পত্নী, মহাভারতে বিচিত্রবীর্য, পাণ্ডু, অর্জুনের একাধিক পত্নী, লৌকিক সাহিত্যেও এর ঝুরি ঝুরি প্রমাণ পাওয়া যায় । তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে – 'তস্মাদেকো বহ্বীর্জায়া বিন্দতে' (৬.৫.১.৪) অর্থাৎ একজন পুরুষ বহু পত্নী গ্রহণ করতে পারে । শতপথব্রাহ্মণে উক্ত হয়েছে একজন পুরুষ সাধারণভাবে বহু স্ত্রীর প্রভু হতে পারে । আবার ঐ ব্রাহ্মণেই অন্যত্র (১৩.৪.১.৯) বলা হয়েছে রাজার চারজন রাণী থাকবেন – মহিষী, বাবাতা, পরিবৃক্তা, পালাগলী । রামায়ণের বালকাণ্ডে (১৪.৩৫) অশ্বমেধযজ্ঞে যজমান রাজার সাহায্যকারিণী মহিষী, পরিবৃক্তা, বাবাতা – এই তিন রাণীর উল্লেখ পাওয়া যায় । তবে এই বহুবিবাহ প্রথাকে কখনোই সর্বজন স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি । সামাজিক দিক থেকে কখনো কখনো এই প্রথাকে উদারদৃষ্টিতে দেখা হলেও ক্ষেত্রবিশেষে এটিকে অবাঞ্ছিত ও নিন্দার চোখে দেখা হত । সপত্নীদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের অসংখ্য উদাহরণ এই বক্তব্যের প্রমাণ দেয় । ঋগ্বেদের মন্ত্রে (১০.১৫৯.৫-৬) ইন্দ্রপতি শচী সপত্নীদেরকে দমন করে আত্মপ্রভূত্ব প্রতিষ্ঠার কথা সগর্বে ঘোষণা করেছেন । আপস্তম্বগৃহ্যসূত্রেও (৯.৯) বলা হয়েছে ঋগ্বেদের উক্ত মন্ত্রটি সপত্নী দমনের জন্য পাঠ করবে । পুরুষের ক্ষেত্রেও যে সর্বদা বহুপত্নী সঙ্গলাভ সুখকর ছিল না তার প্রমাণ পাওয়া যায় ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে যেখানে আপ্ত্যত্রিত নামক এক ব্যক্তি কূপমধ্যে পতিত হয়ে বিশ্বদেবগণের উদ্দেশ্যে নিজের দুঃখ জানাতে গিয়ে বলেছিলেন – সপত্নীদ্বয় স্বামীর দুই পাশে থেকে যেমন তাকে সন্তাপ দেয় কূপের এই দুই পাশ আমাকে সন্তাপ দিচ্ছে (ঋগ্বেদসংহিতা – ১.১০৫.৮) ।

স্থান, কাল ও অবস্থা বিশেষে আমাদের দেশে পুরুষের বহুবিবাহ প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত ও সমর্থিত থাকলেও স্বামী জীবিতাবস্থায় নারীর পক্ষে অন্য স্বামী গ্রহণ অত্যন্ত নিন্দাজনক ছিল । প্রকৃতপক্ষে মহাভারতে দ্রৌপদীর পঞ্চপতির প্রসঙ্গ ছাড়া অন্যত্র, এমনকি উদার বৈদিকযুগেও এক নারীর একাধিক পতি গ্রহণের কথা স্পষ্টভাবে শোনা যায় না । পুরুষের বহুপত্নী গ্রহণ সমর্থিত থাকলেও নারীর বহুপতি গ্রহণ নৈব নৈব চ । তৈত্তিরীয়সংহিতায় (৬.৬.৪.৩) স্পষ্টভাবে উল্লেখিত আছে – 'যদেকস্মিন্ যূপে দ্বে রশনে পরিব্যয়তি তস্মাদেকো দ্বে জায়ে বিন্দতে, যন্নৈকাং রশনাং দ্বয়োর্যূপয়োঃ পরিব্যয়তি তস্মান্নৈকা দ্বৌ পতী বিন্দতে' অর্থাৎ একটি যূপকাষ্ঠ যেমন দুটি রজ্জু দ্বারা বেষ্টন করা সহজসাধ্য তেমনি একজন পুরুষ দুজন পত্নী সহজেই গ্রহণ

করতে পারে । কিন্তু একটি রজ্জু দ্বারা যেমন পৃথকভাবে দুটি যূপকাষ্ঠ বেষ্টন করা যায় না তেমনি একজন নারী দুইজন পতি গ্রহণ করবে না । একই রকম উক্তি ঐতরেয়ব্রাহ্মণে (১২.১২) পাওয়া যায় – 'তস্মাদেকস্য বহ্ব্যো জায়া ভবন্তি, নৈকস্যৈবহবঃ সহপতয়ঃ' অর্থাৎ একজন পুরুষের বহু স্ত্রী থাকতে পারে কিন্তু একজন নারীর একসাথে বহু স্বামী থাকতে পারে না । যদিও ঋগ্বেদের কয়েকটি মন্ত্রে (১০.৩৭, ১০.৩৮, ১০.৮৫) এক নারীর একাধিক স্বামীর সাথে সহবাসের ইঙ্গিত পাওয়া যায় । প্রকৃতপক্ষে বৈদিক সাহিত্যে এমন কোনও মন্ত্র পাওয়া যায় না যেখানে এক নারীর বহুবিবাহের কথা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে । কিন্তু মহাভারতে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতাকে স্বামী রূপে গ্রহণ করা যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টিতে কখনই অধর্ম নয় । এইরকম বিবাহ সমাজে প্রচলন ছিল তার উদাহরণও যুধিষ্ঠির দিয়েছেন – গৌতমবংশ জাতা এবং ধর্মে নিষ্ঠাবতী জটিলা নামক এক নারী সাতজন ঋষিকে পতিরূপে গ্রহণ করেছিলেন । কণ্ডু নামক ঋষিকন্যা বার্ক্ষী দশজন প্রচেতার সাথে সমাগম করেছিলেন (মহাভারত, আদিপর্ব – ১৯৫.১৩-১৫) । যাই হোক, মহাভারত ছাড়া বৈদিকযুগ বা তৎপরবর্তী সাহিত্যে নারীর বহুপতি লাভের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ কোথাও পাওয়া যায় না ।

ভারতীয় সমাজে নারীর একসাথে বহুপতিবরণ ব্যাপারটি কখনোই স্বাভাবিকভাবে স্বীকৃত হয়নি। কিন্তু আমাদের ভুললে হবে না বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্যই হল সন্তান উৎপাদন অর্থাৎ বংশধারা বজায় রাখা । তাই নারীর বহুপতিবরণ স্বীকৃত না হলেও সন্তান উৎপাদনের জন্য স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের সাথে সহবাস বৈদিককাল থেকেই সমাজে প্রচলিত ছিল । আপস্তম্বধর্মসূত্রে (২.১০.২৭.২-৪) স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে সন্তান উৎপাদনে অক্ষম পতি পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদানের বাসনায় নিয়োগ প্রথার মাধ্যমে সন্তান উৎপাদনের জন্য তার স্ত্রীকে দেবর বা অন্য সগোত্র-সপিণ্ডদের মধ্যে স্ত্রীরূপে দান করতে পারতো । কিন্তু কখনোই এই দান সগোত্রীয় নয় এমন ব্যক্তিদের মধ্যে করা হত না । কিন্তু এসব ক্ষেত্রে ঐ স্ত্রী যে অন্যান্য পুরুষদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হত তার কোনও স্পষ্ট উল্লেখ নেই ।

নারীর পুনর্বিবাহ বিষয়টি বারংবার শাস্ত্র থেকে শাস্ত্রান্তরে সমালোচিত । স্বামীর জীবিতাবস্থায় সন্তানোৎপাদনে অক্ষম পতি ও শ্বশুরগৃহের সম্মতি ক্রমে বিবাহিত নারী পুনরায় অন্য পুরুষের প্রতি গমন করতে পারে এবং তাদের মিলন জাত সন্তান সমাজে স্বীকৃত ছিল । মহাভারত এর

প্রকৃষ্ট উদাহরণ । কিন্তু সন্তানহীনা বিধবা নারীর ক্ষেত্রেও কি একই বিধান বলবৎ কিংবা বিধবা নারী কি পুনরায় বিবাহবন্ধনে অধিকারী এই নিয়ে স্মৃতিকারদের মধ্যে মতভেদ আছে । অধিকাংশ স্মার্তকারগণ এইরকম বিবাহের বিরোধিতা করলেও কেউ কেউ আবার অবস্থাবিশেষে সমর্থন করেছেন । বিধবা বিবাহিতা নারীকে 'পুনর্ভূ' বলা হত । ঋগ্বেদের সময় বিধবাবিবাহের প্রচলন ছিল বলেই মনে করা যায় । ঋগ্বেদের দুটি মন্ত্র এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য–

ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষা সং বিশন্তু ।

অনশ্রবোঽনমীবাঃ সুরত্না আ রোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্রে ।।

উদীর্ষ্ব নার্যভি জীবলোকং গতাসুমেতমুপ শেষ এহি ।

হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভি সং বভূথ ।। (১০.১৮.৭-৮)

সায়ণাচার্য মন্ত্রদুটির ভাষ্যে বলেছেন, জ্যেষ্ঠভ্রাতার মৃত্যুর পর দেবর তার শোকসন্তপ্ত ভ্রাতৃবধূকে তার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সংসারধর্ম পালনের জন্য শ্মশানভূমি থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানাচ্ছেন । কেউ কেউ এই মন্ত্রদুটিতে সহমরণ প্রথার ইঙ্গিত দিয়েছেন। কিন্তু সায়ণের মতানুসারে স্বামী মারা গেলে সন্তানহীনা বিধবা স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে পতিরূপে গ্রহণ করতে পারতেন । মনে রাখতে হবে 'দেবর' শব্দের অর্থ দ্বি-বর অর্থাৎ দ্বিতীয় বর । সায়ণের এই উক্তির সামঞ্জস্য দেখা যায় পুরাণ ও পরাশর প্রভৃতি স্মৃতিকারদের রচনাতে । অথর্ববেদেও পুনর্ভূ শব্দের এবং বিধবা বিবাহের স্পষ্ট ইঙ্গিত ও সমর্থনও পাওয়া যায় –

যা পূর্বং পতিং বিত্বাঽথান্যং বিন্দতেঽপরম্ ।

পঞ্চৌদনং চ তাবজং দদাতো ন বি যোষতঃ ।।

সমানলোকো ভবতি পুনর্ভূর্বাপর পতি ।

যোঽজং পঞ্চৌদনং দক্ষিণাজ্যোতিষং দদাতি ।। (৯.৫.২৭-২৮)

স্বামীর মৃত্যুর পর যে নারী অন্য কোনও পুরুষকে বিবাহ করে, সে যদি তার দ্বিতীয় স্বামীর সাথে একত্রে দেবতার উদ্দেশ্যে পাঁচ পাত্র অন্ন ও একটি ছাগ দান করে তাহলে তারা একে

অন্য থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না । এই দ্বিতীয় স্বামী যদি দেবতার উদ্দেশ্যে পাঁচ পাত্র অন্ন, একটি ছাগ ও সামান্য কিছু দক্ষিণা নিবেদন করে, তাহলে মৃত্যুর পর সে তার ঐ স্ত্রীর সাথে একই স্বর্গে অবস্থান করে । 'পুনর্ভূ' শব্দের অর্থ স্বামীর মৃত্যুর পর যে নারী পুনরায় বিবাহ করে । এইরকম বিবাহে নিন্দার স্পর্শ থাকলেও যজ্ঞ প্রভৃতির মাধ্যমে বিবাহকে শুদ্ধ করে নেওয়া হত। তৈত্তিরীয়সংহিতাও বিধবাবিবাহকে সমর্থন করে তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'দৈবিষব্য' (৩.২.৪.৪) শব্দের দ্বারা, যার অর্থ বিধবা নারীর পুনর্বার বিবাহের পর উৎপন্ন পুত্র । স্মৃতিশাস্ত্রে এইরূপ পুত্রকে পৌনর্ভব বলা হয় । গৃহ্যসূত্রগুলিতে বিধবাবিবাহের প্রসঙ্গে আলোচনা তেমনভাবে পাওয়া যায় না । এরপর স্মৃতিশাস্ত্রের যুগে নানা প্রসঙ্গে বিধবাবিবাহ আলোচিত হয়েছে ।

বিধবা বিবাহিতা নারীকে 'পুনর্ভূ' আখ্যা দেওয়া হলেও যাজ্ঞবল্ক্য 'পুনর্ভূ' সম্বন্ধে বলেছেন – 'অক্ষতা বা ক্ষতা চৈব পুনর্ভূঃ সংস্কৃতা পুনঃ' (১.৬৭) অর্থাৎ যে নারীর বিবাহ সম্পূর্ণ হয়নি এবং কেবলমাত্র বাগদান জাতীয় ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়েছে অথবা যে কন্যা বিবাহিত অবস্থায় কিছু কাল স্বামীর সাথে কাটিয়েছে তারা যদি বিধবা হওয়ার পর পুনরায় বিবাহ করে তারা পুনর্ভূ নামে অভিহিতা । স্মৃতিচন্দ্রিকা গ্রন্থে কশ্যপের অভিমতে সাতরকমের পুনর্ভূর উল্লেখ পাওয়া যায় । যথা, (১) বাগদত্তা কন্যা, (২) কন্যার জ্ঞাতসারে পিতা মাতা যে কন্যাকে কোনও পাত্রের হাতে সম্প্রদান করবেন বলে মনে মনে সংকল্প করেছেন, (৩) ভাবী স্বামী যে কন্যার হাতে মঙ্গলসূত্র বেঁধে দিয়েছেন, (৪) যে কন্যার পিতা জল স্পর্শ করে কোনও পাত্রের হাতে দান করার সংকল্প করেছেন, (৫) যে কন্যার বিবাহকালে তার ভাবী স্বামী তার পাণি স্পর্শমাত্র করেছে কিন্তু বিবাহের অন্যান্য কাজ সম্পূর্ণ হয়নি, (৬) যে কন্যাকে অগ্নিপ্রদক্ষিণ করানো হয়েছে কিন্তু বিবাহের কাজ সম্পূর্ণ হয়নি, (৭) বিবাহের পর যে কন্যাসন্তান প্রসব করেছে । মহামতি কশ্যপের মতে উক্ত সাতটির মধ্যে প্রথম পাঁচটির ক্ষেত্রে বিবাহানুষ্ঠান সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই অথবা সপ্তপদ গমনের আগেই বর মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং ঐ কন্যা যদি অন্য পাত্রের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় তাহলে সেই কন্যাকে পুনর্ভূ আখ্যা দেওয়া হয় । ষষ্ঠটি ও সপ্তমটির ক্ষেত্রেও পুনর্ভূ বলা যায় । কশ্যপ যদিও বলেছেন পুনর্ভূ নারী কুল ও বংশ দগ্ধ করে কিন্তু বাস্তবতার বিচারে এই ধরনের বিবাহের উল্লেখ থেকে বোঝা যায় এইরকম বিবাহ সমাজে কেবলমাত্র অস্বাভাবিক ছিলই না সমাজস্বীকৃতও বটে । বৌধায়নও কশ্যপের উক্তির অনুরূপ

বলেছেন । বিবাহ সম্পূর্ণ হওয়ার আগে অর্থাৎ বিবাহের অংশমাত্র অনুষ্ঠিত হলে তাকেও বিবাহের সমতুল্য মনে করা হত এবং দ্বিতীয় বিবাহের পর এইরূপ নারী পুনর্ভূ নামে অভিহিত।

এখন প্রশ্ন দ্বিতীয়বিবাহে কীরূপ পাত্র উপযুক্ত ? ভগবান মনু বলেছেন কোন বাগদত্তা কন্যার ভাবী স্বামীর মৃত্যু হলে ঐ বরের ছোট ভাই বিবাহবিধানের নিয়মানুসারে ঐ কন্যার পাণিগ্রহণ করবে এবং সুসন্তান লাভের আশায় ঐ কন্যা শুদ্ধচারিণী ও বিধবার চিহ্নযুক্ত সাদা কাপড় পরে দেবরের কাছে উপস্থিত হবে (৯.৬৯-৭০) । মনুর এইরূপ উক্তি থেকে সহজেই অনুমান করা যায় মনু বিধবা নারীর পুনর্বিবাহকে সরাসরি স্বীকার করেননি বরং মনুসংহিতার পঞ্চমাধ্যাপঞ্চমাধ্যায়ে তিনি স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন – 'ন দ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং ক্বচিদ্ ভর্তোপদিশ্যতে' (৫.১৬২) । অন্যত্রও মনু বলেছেন - 'সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে' (৯.৪৭) এবং 'ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ' (৯.৬৫) । এথেকে স্পষ্টই অনুধাবন করা যায় মনু প্রধানতঃ বিধবাবিবাহ বিরোধী ছিলেন । বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য সন্তান উৎপাদন । বিবাহবন্ধনে জাত সন্তানের দ্বারাই পিতা 'পুৎ' নামক নরক থেকে উদ্ধার করে এবং পূর্বপুরুষেরও মুক্তিলাভ ঘটে । কিন্তু সন্তান জন্মানোর আগেই যদি স্বামী মারা যায় তাহলে নরক থেকে মুক্তিলাভ কীরূপে সম্ভব ? অতএব পুত্রহীনা বিধবা নারীর পুত্র লাভার্থে বিবাহের প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করা যায় । কিন্তু এইরূপ যুক্তি খন্ডিত হয় মনুর উক্তির দ্বারা

মৃতে ভর্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য ব্যবস্থিতা ।
স্বর্গং গচ্ছতি অপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ ।। (৫.১৬০)
অপত্যলোভাদ্ যা তু স্ত্রী ভর্তারমতিবর্ততে ।
সা ইহ নিন্দামাপ্নোতি পতিলোকাচ্চ হীয়তে ।। (৫.১৬১) ।

মনু এখানে স্পষ্টই বলেছেন পতিহীনা বিধবা স্ত্রী ব্রহ্মচর্য পালন করবেন । সেই স্ত্রী পুত্রহীনা হলেও নিশ্চয়ই স্বর্গে যাবেন । বরং পুত্রলোভে মৃতস্বামীকে অপমানিত করে দ্বিতীয়বার অন্য পুরুষকে পতিরূপে বরণ করেন, তিনি ইহলোকে সকলের নিন্দাভাজন তো হয়ই, স্বর্গলোক থেকেও বঞ্চিত হন । মহাভারতের আদিপর্বে সধবা বা বিধবা নারীর পুনরায় বিবাহকে দীর্ঘতমা ঋষি কঠোরভাবে নিন্দা করেছেন । তিনি বলেছেন স্ত্রীলোকের পক্ষে আজীবন পতিই একমাত্র

পরম অবলম্বন । পতির মৃত্যু হলে বা পতির জীবিতাবস্থায় স্ত্রী অন্য কোনও পুরুষকে আশ্রয় করবে না । সধবা বা বিধবা স্ত্রী যদি অন্য পুরুষকে আশ্রয় করে তাহলে সে সমাজে পতিত হবে । বিধবা রমণী যদি অন্য পুরুষের সাথে সংসর্গ করে, তাহলে তার মৃত পতির প্রচুর ধন থাকলেও তা ভোগ করার চেষ্টা তার পক্ষে নিষ্ফল হবে । বলপূর্বক ঐ ধন ভোগ করলে সে নিন্দনীয় হবে এবং আত্মীয় স্বজনেরা তাকে ত্যাগ করবে (মহাভারত, আদিপর্ব – ১০৩.৩৫-৩৮)।

টীকাকার অপরার্ক ব্রহ্মপুরাণে থেকে বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন –

স্ত্রীণাং পুনর্বিবাহস্তু দেবরাৎ পুত্রসন্ততিঃ ।
স্বাতন্ত্র্যং চ কলিযুগে কর্তব্য ন কদাচন ।।

হিন্দুশাস্ত্রমতে বিবাহ, পৃ. -৫৭

স্ত্রীলোকের পুনরায় বিবাহ বা নিয়োগপ্রথার মাধ্যমে দেবরের দ্বারা সন্তান ধারণ এবং যথেচ্ছচারিতা এই কলিযুগেও করা উচিত নয় । এই প্রসঙ্গে অপরার্ক ব্রহ্মপুরাণের আরও একটি উদাহরণ দিয়েছেন –

যদি বা বালবিধবা বলাৎ ত্যক্তাঽথবা ক্বচিৎ ।
তদা ভূয়স্তু সংস্কার্যা গৃহীতা যেন কেনচিৎ ।।

হিন্দুশাস্ত্রমতে বিবাহ, পৃ. -৫৮

বালবিধবা নারী বা স্বামী পরিত্যক্তা নারীকে বিবাহের জন্য নির্দিষ্ট মন্ত্র ও আচারাদি প্রয়োগ করে তাকে উপযুক্ত যে কোনও পাত্রের সাথে বিবাহ দেওয়া যেতে পারে । এথেকে বোঝা যায় অবস্থা বিশেষে বিধবা বা সধবা নারীর পুনর্বিবাহ অপরার্কর মত স্মার্তপণ্ডিত স্বীকার করেছেন ।

পবিত্র বৈদিকযুগেও বিধবা নারীর পুনর্বিবাহের ইঙ্গিত পাওয়া যায় । ঋগ্বেদের দশমমণ্ডলের একটি মন্ত্রে ঋষি অশ্বিদ্বয়কে আহ্বান করার সময় উপমা হিসাবে ব্যবহার করেছেন - 'বিধবা রমণী শয়নকালে দেবরকে সমাদর করে ...' । এতদ্বারা বোঝা যাচ্ছে বিধবার অসচ্ছরিত্র

অবলম্বন করা প্রকটিত হচ্ছে না, স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা রমণী স্বামীর ভ্রাতাকে বিবাহ করার প্রথাই উল্লিখিত হচ্ছে । অথর্ববেদেও এইরূপ ধ্বনি শোনা যায় ।

ইয়ং নারী পতিলোকং বৃণানা নিপদ্যত উপ ত্বা মর্ত্য প্রেতম্ ।

ধর্ম পুরাণমনুপালয়ন্তী তস্যৈ প্রজাং দ্রবিণাং চেহ ধেহি ।। (১৯.৩.১)

অর্থাৎ হে মনুষ্য যে বিধবা স্ত্রী পতির জন্য অর্থাৎ গৃহাশ্রমের সুখ পেতে ইচ্ছা করে তাকে সনাতন নিয়মানুসারে সন্তান ও ধন দান কর । এখানে আরও স্পষ্ট হল সন্তানোৎপাদনে ইচ্ছুক বিধবা নারী পুনরায় বিবাহ করতে পারবে । এই সূক্তে পুনরায় উল্লেখিত হয়েছে -

অপশ্যং যুবতিং নীয়মানাং জীবাং মৃতেভ্যঃ পরিনীয়মানাম্ ।

অন্ধেন যত্তমসা প্রাবৃতাসীৎ প্রাক্তো অপাচীনয়ং তদেনাম্ ।। (১৯.৩.৩)

বিধবা যুবতী নারীর জীবন কীরূপ দুর্বিসহ, অশান্তময় তা অনুধাবন করে ঋষি কবি সমাজকে অনুরোধ করে বলেছেন বিধবা যুবতী নারীকে বিবাহবন্ধনে পুনরায় আবদ্ধ করে তার জীবনকে সুন্দর মধুময় করে তুলুন । তৈত্তিরীয় আরণ্যকেও শোনা যায় বিধবা নারী পুনর্বিবাহের ইচ্ছা করলে দ্বিতীয় পতির হাত গ্রহণ করবে । যদিও বৌধায়নধর্মসূত্রে (১.১.১৭-১৮) বিধবানারীর পুনর্বিবাহ অনুমোদিত হয়নি কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিধবানারীর পুনর্বিবাহ গৃহীত হয়েছে । যথা বলপূর্বক কন্যাহরণে বিধিগতভাবে বিবাহ না হলে সেই কন্যা বিধিপূর্বক অন্যের বিবাহযোগ্যা হয় । বৌধায়ন মতে এইরূপ কন্যা কুমারীকন্যাবৎ । অথবা বিবাহকালে বিবাহহোমের পর পতি মারা গেলে সেই বিবাহিতা কন্যা পিতৃগৃহে ফিরে পুনরায় বিবাহযোগ্যা হয় ।

মহাভারতের নল-দময়ন্তী উপাখ্যানেও দেখা যায় বহুকাল স্বামী নলের কোন সন্ধান না পাওয়ায় রাজা ঋতুপর্ণ পুনরায় দময়ন্তীর স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করেছেন (বনপর্ব – ৭০.২৫-২৭) । আরও স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় অর্জুন নাগরাজ ঐরাবতের বিধবাকন্যার পাণিগ্রহণ করেন (ভীষ্মপর্ব – ১১ অধ্যায়) ।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় (১.৬৫) দেখা যায় বাগদত্তাকন্যাকে পূর্ববর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠবরে দান করা যায়। মুনিবর এখানে বিধবা নারীর বিবাহ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেননি যদিও বাগদানকে বিবাহের সমতুল্য মনে করা হত প্রাচীনভারতে ।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে স্বামী পরিত্যক্তা বা বিধবা নারীদের পুনর্বিবাহ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য নির্দশন পাওয়া যায় । মহামতি কৌটিল্য বলেছেন স্বামী বহুকাল প্রবাসী বা সন্ন্যাস গ্রহণকারী বা মৃত হলে সন্তানহীনা স্ত্রী সাত মাস অপেক্ষা করবে এবম সন্তানবতী স্ত্রী একবছর অপেক্ষা করবে । এই সময়ের মধ্যে স্বামীর কোন খবর পাওয়া না গেলে সেউ স্বামীর ভ্রাতাকে পতিরূপে গ্রহণ করবে । মৃতপতির বহুভ্রাতা থাকলে পতির ঠিক পরবর্তী সহোদরকে বা স্ত্রীকে প্রতিপালন করতে সমর্থ এমন অন্য কোনও ভ্রাতাকে বিবাহ করতে পারে । মৃতপতির কোন ভ্রাতা না থাকলে পতির বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে বা পতির বংশোৎপন্ন ও নিকট সম্বন্ধযুক্ত কোনও পুরুষকে বিবাহ করতে পারে । মহামতি কৌটিল্য আরও স্পষ্ট করে বলেছেন বিধবা পুনর্বিবীহিতা নারী ‘বিন্ধমানা’ এবং দ্বিতীয় বিবাহ ‘নিবেশ’ নামে খ্যাত (অর্থশাস্ত্র – ৩.৪.৯) । এই উক্তি থেকে পরিস্কার বোঝা যায় কৌটিল্য বিধবা নারীর পুনরায় বিবাহে উদার মনোভাবাপন্ন ছিলেন ।

বিধবাবিবাহের স্বপক্ষে একই অভিমত দিয়েছেন পরাশর (পরাশরসংহিতা – ৪.৩০), নারদনারদ (নারদস্মৃতি, স্ত্রীপুংসযোগ – ৯৭) এবং অগ্নিপুরাণ (১০৪.৫) । পরাশরসংহিতায় স্পষ্ট করে উল্লেখিত হয়েছে –

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যে বিধীয়তে ।। (৪.৩০)

স্বামী নিরুদ্দেশ হলে বা মারা গেলে বা সন্ন্যাস গ্রহণ করলে বা ক্লীব বলে প্রমাণিত হলে অথবা চরিত্রভ্রষ্ট হলে – এই পাঁচটি আপৎকালে স্ত্রীর পুনর্বিবাহ শাস্ত্র অনুমোদিত । এই একই সুর শোনা যায় নারদস্মৃতি ও অগ্নিপুরাণে । যদিও পরাশর পরক্ষণেই বলেছেন বিধবা নারী ব্রহ্মচর্য পালনে মৃত্যুর পর স্বর্গবাস করেন । মানবশরীরে বিদ্যমান সাড়ে তিন কোটি সংখ্যক সংবৎসর স্বর্গবাস করবে মৃতস্বামীর সহমৃতা স্ত্রী (৪.৩১-৩২) ।

আধুনিককালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় নারীদের বিশেষত বিধবা নারীদের উন্নতিসাধনে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের নিকট হতে 'বিধবা বিবাহ আইন' পাশ করেন । তাঁর 'বিধবা বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাবে' বিধবা নারীর পুনর্বিবাহ শাস্ত্রসম্মত কর্তব্য কর্ম বলে যে সিদ্ধান্ত করেছেন তার মূল ভিত্তি হল পরাশরের 'নষ্টে মৃতে …' ইত্যাদি শ্লোক । স্মৃতিকারগণপুনর্বিবাহিতা নারীকে 'পুনর্ভূ' ও তার পুত্রকে 'পৌনর্ভব' বলে যে নির্দেশ করেছেন তাতে কিছুটা তাচ্ছিল্যের ভাব বিদ্যমান । বিদ্যাসাগর মহাশয় এই অভিমতের বিরূদ্ধে দেখিয়েছেন পরাশর মুনি পৌনর্ভব পুত্রকে স্বীকার করেননি । তিনি কেবলমাত্র চতুর্বিধ পুত্রের উল্লেখ করেছেন – ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিমকঃ সুতঃ (পরাশরসংহিতা – ৪.২২.১) । বিদ্যাসাগর মহাশয় পরাশরের অভিমতকে স্বীকৃতি দিয়ে বলেছেন বিবাহিতা বিধবার গর্ভজাত সন্তান 'ঔরসসন্তান' কোনভাবেই অবৈধ্য নয় ।

বিধবা নারীর পুনর্বিবাহের ক্ষেত্রে দুটি প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই উঠে আসে – (ক) দ্বিতীয়বিবাহে বিধবা নারীর গোত্র কী ? (খ) স্ত্রীর দ্বিতীয় বিবাহে মন্ত্রই বা কী ? যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার টিকাকার বিশ্বরূপ (যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা. ১.৬৭ শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে) বলেছেন পিতা হল কন্যাপ্রদ অর্থাৎ তিনি কুমারীকন্যাকে পাত্রের হাতে দান করেন । এই দানের পূর্বপর্যন্ত কন্যা পিতৃগোত্র দ্বারা পরিচিত এবং বিবাহের পর পতির গোত্রান্তর্ভুক্ত হয় । কিন্তু কোথাও কোথাও দেখা যায় কন্যার কুমারীত্ব না থাকলেও অর্থাৎ দ্বিতীয় বিবাহে সম্প্রদানের সময়ও পিতাকে কন্যাপ্রদ বলা হয় ।

'কন্যাপ্রদ ইতি বচনাদ্ অক্ষতায়া এব নৈয়মিকং দানম্ ।

পিতা তু অকন্যামপি দদ্যাৎ ইতি কেচিৎ ।।'

(মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, *হিন্দুশাস্ত্রমতে বিবাহ* - পৃ. ৬০ ।)

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় বিবাহের মন্ত্রে কোথাও উল্লেখ নেই এই মন্ত্র কেবলমাত্র প্রথম বিবাহের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য দ্বিতীয় বিবাহের ক্ষেত্রে নয় । সুতরাং যে সমস্ত বৈদিক মন্ত্র দ্বারা প্রথম বিবাহ সম্পন্ন হয় দ্বিতীয় বিবাহেও সেই কার্যকরী হবে ।

স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান অনুসারে বিধবা নারীর পুনর্বিবাহ প্রায় নিষিদ্ধ হয়েছিল । যদিও কয়েকজন স্মৃতিকার (পরাশর, নারদ) বিধবা নারীর বিবাহে সম্মত ছিলেন কিন্তু তাঁরা এবিষয়ে সুদীর্ঘ

আলোকপাত করেননি । যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় (আচারাধ্যায় – ৬৭) বলা হয়েছে – ‘অক্ষতা চ ক্ষতা চৈব পুনর্ভূঃ সংস্কৃতা পুনঃ’ । এখানে ‘পুনর্সংস্কৃতা’ অর্থে পুনর্বিবাহ বলেছেন টীকাকার । আচার্য মনুও ১৭৬নং শ্লোকে বলেছেন ‘পুনঃসংস্কারমর্হতি’ । এর অর্থ কুল্লুকভট্ট করেছেল ‘পুনর্বিবাহাখ্যং সংস্কারমর্হতি’ । তবুও বলা যায় সুবৃহৎ বৈদিকসাহিত্য, স্মৃতিশাস্ত্র, পুরাণসাহিত্য, মহাকাব্য সর্বত্রই বিবাহ নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা থাকলেও নারীর পুনর্বিবাহ বা বিধবাবিবাহ বিষয়ে দু-একটি কথা ছাড়া তেমনভাবে কিছু পাওয়া যায় না । সমাজসংস্কারক রঘুনন্দন এপ্রসঙ্গে নীরব থেকেছেন । বরং দেখা যায় প্রত্যেকেই বিধবার ব্রহ্মচর্য পালনকেই বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন । আধুনিকযুগে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরিশ্রম সাধ্য ফসল Hindu Widow’s Remarriage Act (1856) অনুসারে জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল বিধবা নারী পুনর্বিবাহে অধিকারী এবং পুনর্বিবাহ দ্বারা জাত সন্তান বৈধ । কিন্তু এই আইন চালু হওয়ার দেড়শ বছর পরেও বিধবা নারীকে বিবাহ করার জন্য পুরুষদের মধ্যে খুব সাড়া পড়েছে বলে মনে হয় না । শাস্ত্রের কঠোর বিধান যে এর কারণ তা মনে করলে ভুল হবে । আসল ব্যাপার হল মেয়েদের স্বাভাবিক একটা অনিচ্ছা থেকেই এর ব্যাপক প্রসার হয়নি । কারণ এখনও পর্যন্ত বিবাহের ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় মেয়েরা বেশী গুরুত্ব আরোপ করে থাকে এবং বিবাহকে কেবল একটা বায়োলজিক্যাল ব্যাপার না মনে করে তাকে একটা ‘আধ্যাত্মিক কান্ড’ এইরূপ ধারণা মনে পোষণ করে সন্তোষ লাভ করে । তাই দেখা যায় ইংরেজ আমলে বিধবাবিবাহ আইন প্রচলন হলেও সমাজের বিধবারা খুব একটা সুযোগ গ্রহণ করেননি ।

সিদ্ধান্ত

সবশেষে বলা যায়, ভারতবর্ষের বহু আদিবাসী সমাজে স্বামীর মৃত্যু হলে বা স্বামীর দ্বারা পরিত্যক্ত হলে বা স্বামী নিরুদ্দেশ হলে নারীদের পুনর্বিবাহ প্রচলন দেখা যায় । যে সমাজে মেয়েদের তুলনায় পুরুষের সংখ্যা কম সেখানেই এই ঘটনা দেখা যায় । মহামহোপাধ্যায় পি.ভি কানে তাঁর গ্রন্থে মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও কর্ণাটক অঞ্চলে এইরূপ বিবাহের কথা বলেছেন ।

গ্রন্থপঞ্জি

অর্থশাস্ত্র, সম্পা. শ্রী শ্রী জীবনন্যায় তীর্থ, শ্রী সীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৩৬৯ (বঙ্গাব্দ).

আপস্তম্বধর্মসূত্র, সম্পা. উমেশ চন্দ্র পাণ্ডে, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, বারাণসী, ১৯৬৯.

আপস্তম্বশ্রৌতসূত্র, সম্পা. এ. সি. শাস্ত্রী ও পি. শাস্ত্রী, বরোদা ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউশন, বদোদরা, ১৯৬৩.

আর্যশাস্ত্র, সম্পা. শ্রী শ্রী জীবনন্যায় তীর্থ, শ্রী সীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৩৬৯ (বঙ্গাব্দ).

উদ্বাহতত্ত্ব, সম্পা. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ১৯৯৬.

ঋগ্বেদসংহিতা, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, দিল্লি, পুনর্মুদ্রণ, ২০০৮.

কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্, সম্পা. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী, প্রথম খণ্ড, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কোলকাতা, ২০০২.

গৌতমধর্মসূত্র, সম্পা. নরেন্দ্রকুমার, বিদ্যানিধি প্রকাশন, দিল্লী, ২০১০.

যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি, সম্পা. গঙ্গাসাগর রায়, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, দিল্লি, ২০০৭.

পরাশরস্মৃতি, সম্পা. চন্দ্রকান্ত তর্কালংকার, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, ওরিয়েন্টাল বুক সেন্টার, দিল্লি, ২০০৭.

পরাশরসংহিতা, সম্পা. চন্দ্রকান্ত তর্কালংকার, Vol-I ও II, ওরিয়েন্টাল বুক সেন্টার, দিল্লি, ২০০৭.

বিদ্যাসাগর রচনাবলী, সম্পা. দেবকুমার দাস, Vol II, মণ্ডল বুক হাউস, কোলকাতা, ১৯৬৬.

বিদ্যাসাগর রচনাবলী, সম্পা. দেবকুমার বোস, দ্বিতীয় খণ্ড, মণ্ডল বুক হাউস, কলিকাতা, ১৯৬৬.

বৌধায়ণধর্মসূত্র, সম্পা. উমেশচন্দ্র পাণ্ডে, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, বারাণসী, ১৯৭১.

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু, হিন্দুশাস্ত্রমতে বিবাহ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, প্রথম সংস্করণ, কোলকাতা, ২০০৯.

মনুস্মৃতি, সম্পা. পঞ্চানন তর্কালংকার, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কোলকাতা, ১৩৯৭ (বঙ্গাব্দ).

মনুসংহিতা, সম্পা. পঞ্চানন তর্কালংকার, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কোলকাতা, ১৩৯৭ (বঙ্গাব্দ).

মহাভারত (অনুশাসনপর্ব), সম্পা. রামচন্দ্র নাগায়ণ দণ্ডেকর, ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, পুনে, ১৯৬৬.

শতপথব্রাহ্মণ (প্রথমভাগ), অনুবাদ ও সম্পাদনা, শান্তি ব্যানার্জী, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা, ২০১৬.

Banerji, Sures Chandra. A Companion to Dharmasastra, D.K.Print World Ltd, New Delhi, 1998.

Chatterjee, C. K, Studies in Rites and Rituals of Hindu Marriage in Ancient India, Kolkata, 1978.

Kane, P.V. History of Dharmashastra, B.O.R.I, vol. – I, Poon, 1968